পয়লা বৈশাখ এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক উজ্জীবন

মুস্তাফা মাসুদ

মোগল সম্রাট আকবর প্রবর্তিত বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন প্রকৃতপক্ষে একটি ফসলি সন ফসল চাষাবাদ আর রাজসরকারে খাজনা পরিশোধ-সূত্রে চালু হলেও কালক্রমে সেই কৃষিভিত্তিক সনটির প্রথম মাসের প্রথম দিন অর্থাৎ পয়লা বৈশাখই কালক্রমে হয়ে গেলো বাঙালির জাতীয় জাগরণ তথা রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক উজ্জীবন-চেতনার এক বেগবান উৎস।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হওয়ার পর ধর্মের ভিত্তিতে প্রায় বারোশো মাইল ব্যবধানের দুটি ভূখণ্ড একটি অখণ্ড রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় এলো পাকিস্তান নামে। কিন্তু যে-সমতা, বৈষম্যহীনতা ও স্বাধিকার-চেতনার প্রণোদনায় পাকিস্তানের সৃষ্টি, সূচনা থেকেই তার ব্যত্যয় ঘটতে শুরু করল। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রশাসনে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাধান্য এবং একটা কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে। পূর্বাংশের মানুষদের দাবিয়ে রাখার এবং তাদেরকে হীন জ্ঞান করার প্রবণতা থেকেই প্রথম আঘাতটি এলো মাতৃভাষা বাংলার ওপর। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই ভাষার প্রশ্নে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সাথে বাঙালিদের মতানৈক্য শুরু হয়। পূর্ব বাংলা বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা সমগ্র পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬% আর তাদের মাতৃভাষা বাংলা। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের জনসংখ্যার সেই হার ৪৪%। অথচ তারা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মানলো না, তারা ঘোষণা করল উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। আর এই মানসিকতার আগ্রাসী রূপ সূচিত হলো ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক দমন-পীড়ন ও ১৯৫২ সালে পুলিশের গুলিতে ভাষা-শহিদদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে।

ভাষা-প্রশ্নের পাশাপাশি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনাও ততদিনে শুরু হয়ে গেছে। তার বিপরীতে প্রতিবাদ-প্রতিরোধও জোরদার হয়েছে ক্রমে ক্রমে। যুক্তফন্ট নির্বাচনে বাঙালির বিজয় তার উজ্জ্বল বহির্প্রকাশ। এরপর টেক্সট্ বুক বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকে বাঙালি সংস্কৃতি বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বাষট্টির শিক্ষা-আন্দোলন, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের ছেষট্টির ছয়দফা আন্দোলন, আটষট্টির তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং অতঃপর দুর্বার গণ-আন্দোলন। এরই ফাঁকে ১৯৬১ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে থামিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলল; যদিও সে-অপচেষ্টা সফল হয়নি প্রগতিশীল বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিকর্মীদের সাহসী প্রচেষ্টায়। ড. আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় তখন প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ওপর বৃহদায়ন সঙ্কলন-গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ'। বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য-বঞ্চনার সঙ্গে যুক্ত হলো বাংলা ভাষার প্রধান কবি রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের অপচেষ্টা। রবীন্দ্র-বর্জনকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি সরাসরি আঘাত হিসেবেই দেখা হলো।

সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বাংলা বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখের সাংস্কৃতিক উৎসব। এটি বাঙালির নিজস্ব জিনিস; ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও তাদের দোসর-মিত্ররা নববর্ষ উৎসবকে বিদ্বেষপূর্ণ নজরে দেখত; এই উৎসবকে তারা 'হিন্দুয়ানি' কালচার তথা মুসলিম ঐতিহ্য-বিরোধী বলে বিবেচনা করত। প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক, গবেষক আতোয়ার রহমানের ভাষ্য এমন: ''এ বস্তু বাংলাদেশের একেবারে নিজস্ব, অতি প্রকটভাবে দেশজ। আর সেই জন্যেই তো এদেশের শত্রুরা একদা পয়লা বৈশাখের উৎসবকে ভয়ের চোখে দেখেছে আর বারবার এ উৎসব বন্ধ করে দিতে চেয়েছে।'' [শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত: বাংলা সন ও পঞ্জিকার ইতিহাস-চর্চা এবং বৈজ্ঞানিক সংস্কার, বাংলা একাডেমি, ২০১৪ গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ: বৈশাখ, পৃ. ১০৫।]

বস্তুত, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত রাজনৈতিক তথা স্বাধিকার আন্দোলনের পালে বেগবান হাওয়ার সঞ্চার করে বাংলা নববর্ষ কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক উৎসব। নববর্ষের প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের বিরূপ মনোভাবই এই ঐতিহ্যিক-সাংস্কৃতিক উৎসবটিকে স্বাধিকার চেতনার মর্মমূলে প্রেরণা সঞ্চারী শক্তি হিসেবে স্থিত করে। জানা যায়, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বাঙালির বিজয় ও সাময়িকভাবে প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা লাভের বছর ১৯৫৪ সালে ঢাকার নববর্ষ অনুষ্ঠানে নতুন উৎসাহ আর উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। রাজনৈতিক জাগরণ সাংস্কৃতিক জাগরণকে সেদিন বেগবান করেছিল দারুণভাবে। এ কারণেই জাতীয়তবাদী প্রেরণা সঞ্চারী নববর্ষ উৎসবকে সুবিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় এনে দেশীয় সংস্কৃতির আশ্রয়ে আরর জনসম্পৃক্ত ও ব্যাপক বিস্তারী করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি হয়ে ওঠে। কারণ, রাজনৈতিক জাগরণের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক জাগরণ উত্তুঙ্গ না হলে রাজনৈতিক বিজয় কঠিন হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপলব্ধিও এব্যাপারে আগে থেকেই ইতিবাচক হওয়ায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পালে নতুন হাওয়া লাগে; এবং প্রকারান্তরে তা তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামকে শীর্ষ স্পর্শী হতে সহায়তা

করে। বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার আগেই সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ের অব্যবহিত পরে দেশের শিল্পী সমাজের উদ্দেশে ঠিক একথাটিই বললেন দৃঢ়কণ্ঠে: ''সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। তাই মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে, গণমানুষের সুপ্ত শক্তি ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে বাংলার নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য আপনাদের কাজ করতে হবে।... একটি জাতিকে পঙ্গু ও পদানত করে রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করা।'' [১৯৭১ সালের ২৪ শে জানুয়ারি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে সংগীতশিল্পী সমাজ প্রদত্ত সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। সূত্র: বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু-কোষ, পৃষ্ঠা: ২৫৬] ওই সংবর্ধনা-ভাষণে তিনি আরও বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলন ছিল না, সে-আন্দোলন ছিল বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির আন্দোলন। [ঐ]

স্মরণযোগ্য, রবীন্দ্র-জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট শেখ মুজিবের ছেষট্টির ছয়দফা ঘোষণার পরের বছর (১৯৬৭ সালে) প্রথমবারের মতো রমনা বটমূলে বর্ষবরণ বা পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। ছায়ানটের প্রথম সভাপতি ছিলেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল। সিধু ভাই, ওয়াহিদুল হকসহ অন্য প্রগতিশীল বাঙালি সংস্কৃতি কর্মীবৃন্দ এই সংগঠনের সঙ্গে ছিলেন। ছায়ানট আয়োজিত বর্ষবরণ উৎসব ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সবার মধ্যে অভূতপূর্ব নবজাগরণের সূচনা করে; বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে অসাম্প্রদায়িক এক জাতীয় উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করে এবং তা ওই সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের জোয়ারে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। বস্তুত, গত শতকের মধ্যষাটের দশক বাঙালির অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পরিচালিত আপোশহীন, হার-না-মানা আন্দোলন-সংগ্রামের বছর। 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা' এই স্লোগান শুধু রাজনৈতিক উজ্জীবনীমন্ত্র ছিল না; নববর্ষকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক উৎসবকেও তা প্রাণিত করল বাঙালির স্বকীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের উত্তুঙ্গ ধারার সঙ্গী হতে, পাশাপাশি চলতে। ওই স্লোগানের মর্মবাণী ছায়ানট পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছিল বলেই নববর্ষের অনুষ্ঠান হয়ে গেল বাঙালি চেতনার উজ্জীবনের সমার্থক। এভাবেই নববর্ষের অনুষ্ঠান বাঙালি জাতীয়তাবাদ তথা বাঙালির সামগ্রিক জাগরণ-চেতনার সঙ্গেও একীভূত হয়ে গেল; এবং এক সময় তা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রশস্ত মোহনায় মিশে গিয়েছিল।

আমাদের ধর্ম যার যার, কিন্তু দেশ সবার; দেশের সংস্কৃতি আর সব ইতিবাচক অর্জন সবই আমাদের সবার, এই দেশের সব মানুষের কৃষক, মজুর, জেলে, তাঁতি, কারখানার শ্রমিক, নায়ের মাঝি, অফিসার, কর্মচারী, ধনী-গরিব সকলের। এই চেতনাই তো বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রাণ ভোমরা। সেই প্রাণ ভোমরাকে জাগাতে পয়লা বৈশাখের অসামান্য অবদান আজ সবাই স্বীকার করেন। আর যে মুষ্টিমেয়গোষ্ঠী তা স্বীকার করে না, তারা এখনো বৈশাখের নববর্ষ উৎসবকে ভয় পায়; থামিয়ে দিতে চায় এর অগ্রগমন। ভয় কেন? ওই পশ্চাতপদ, ধর্মান্ধগোষ্ঠী সেই পাকিস্তানের সূচনালগ্নের মতো এখনো বিশ্বাস করে পয়লা বৈশাখে নববর্ষের উৎসব হিন্দুয়ানি আর অনৈসলামিক। অতএব ঠেকাও। আগুন জ্বালো। বোমা ফাটাও। বিগত ২০০০ সালে রমনা বটমূলের বৈশাখী উৎসবে আমরা এই অন্ধকারের দানবদের পৈশাচিক তাণ্ডব তথা নিষ্ঠুর বোমাবাজি দেখেছি; ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিপ্রিয় অনেকগুলো মানুষকে দেখেছি রক্তাক্ত লাশ হতে; দেখেছি আহত হয়ে আর্তচিৎকার করতে। নিরীহ মানুষ মেরে যারা তথাকথিত হিন্দুয়ানি বা অনৈসলামিক কালচারকে তাড়াতে চেয়েছিল, দেশের মানুষ তাদের সমর্থন করেনি।

নববর্ষের অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন মানবিক চেতনার দুর্ভেদ্য কর্ম তাদেরকে রুখে দিয়েছে। নিজস্ব স্বকীয়তায় ভাস্বর এক নিষ্কলুষ সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানমালা থেমে তো যায়ইনি; বরং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার মর্মসঙ্গী হয়ে আরো শক্তি সঞ্চয় করেছে। এই শক্তি ছড়িয়ে পড়েছে শহরে-বন্দরে-নগর-গাঁয়ে। এ যেন সাস্কৃতিক উৎসবের আদলে আমাদের স্বকীয় জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার এক সুদৃঢ় প্রাচীর; তাকে ভাঙতে হলে বাঙালির জাতীয়তাবাদী সত্তাকে বিনাশ করতে হবে; কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে তা কি সম্ভব?

#

লেখক- গ্রন্থকার, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, শিশুসাহিত্যিক ও অনুবাদক

২৮.০৩.২০২২ পিআইডি ফিচার